শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও বাস্তবতা

মো. মাহফুজুর রহমান

প্রকাশ : ৩০ নভেম্বর ২০২৪, ০৫:৩০

বাংলাদেশের যে কোনো তরুণের কাছে যদি জানতে। চাওয়া হয়, তুমি কেন পড়াশোনা করো? উত্তরে সিংহভাগ তরুলই বলবে, একটা চাকরি চাই, যার মাধ্যমে নিজের জীবিকা নির্বাহ করার পাশাপাশি বাবা-মা তথা পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ত্বরান্বিত করবে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ, তাই মৌলিক চাহিদা পূরণে, এ দেশের মানুষের সীমাহীন পরিশ্রম করতে হয়। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী এখনো প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত, যারা তাদের দৈনন্দিন মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও তাদের কাঙ্ক্ষিত জীবনমান নিশ্চিত করতে পারে না। এমতাবস্থায় শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য চাকরি পাওয়া এবং একটু ভালোভাবে জীবনধারণের প্রত্যাশা করাটা অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পড়াশোনা কি শুধুই আয়- রোজগারের একটি উপায়?

দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রবন্ধ ও শিক্ষাবিষয়ক গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের আলোকে শিক্ষার কিছু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যা উন্নত দেশগুলোতে পাঠ্যপুস্তক ও কারিকুলাম তৈরি করার সময় অনুসরণ করা হয়। যেমন প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ছাত্রদের মধ্যে নাগরিক দক্ষতা (Citizenship skills) প্রদান করা এবং পরবর্তী শিক্ষাস্তরের (মাধ্যমিক) জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা। সেক্ষেত্রে উন্নত দেশ, যেমন-কানাডা, ফিনল্যান্ড, জাপান ও বাংলাদেশের নাগরিক দক্ষতার ধরন এক রকম হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের সংস্কৃতি, সামাজিক মূল্যবোধ, আর্থসামাজিক অবস্থান, ভূরাজনৈতিক অবস্থান বিবেচনা করে একজন নাগরিকের যে যে দক্ষতা প্রয়োজন হয়, তা-ই হাওয়া উচিত আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার সিলেবাস বা কারিকুলামের অংশ। যেমন, কানাডায় মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কীভাবে বেঁচে থাকতে হয়, সেটা তাদের নাগরিক দক্ষতার অংশ হতে পারে কিন্তু বাংলাদেশে সেই শিক্ষার কোনো প্রয়োজনীয়তা/ উপযোগিতা নেই। বরং বাংলাদেশে বর্তমানে যেভাবে ক্রমাগত তাপমাত্রা বাড়ছে, এই পরিস্থিতিতে কী করণীয়-সেটি হতে পারে নাগরিক দক্ষতার অংশ। আবার আমাদের দেশে বন্যা হয় মাঝেমধ্যেই, তাই সাঁতার শেখাটাও প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হতে পারে।

আমাদের আর্থসামাজিক বাস্তবতায় একান্নবর্তী পরিবারের যে প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল, তা বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। এর ফলে আগে শিশুদের মধ্যে যে সামাজিক রীতিনীতি (যেমন, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, একে অন্যের প্রতি সহমর্মিতা, অল্প একটু খাবার একাধিক ভাইবোনের মধ্যে ভাগাভাগি করে খাওয়া ইত্যাদি) ছিল, তা অনেকাংশেই হারিয়ে গেছে। আর্থসামাজিক উন্নয়নের বাস্তবতায় ক্রমাগত একান্নবর্তী/যৌথ পরিবার প্রথা বিলুপ্তির পথে। বর্তমানে একক পরিবারপ্রথা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেখানে শিশুদের সুযোগই নেই এমন সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠার। আগে একজনের উপার্জনের টাকায় সংসারের খরচ চলত। কিন্তু বর্তমানে পরিবারে একাধিক সদস্য ও নারীদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের কারণে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরিত হতে হয়েছে, যা একক পরিবার প্রথাকে ত্বরান্বিত করেছে। এমন অবস্থায়

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সত্যিকারের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই মুহূর্তে শিশুদের মধ্যে আমাদের সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ-এইসব গুণের সংমিশ্রণ ঘটানোর উত্তম জায়গা হলো প্রাথমিক স্কুল।

আবার মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো লো- স্কিলড জনগোষ্ঠী তৈরি করা এবং যাদের আগ্রহ ও যোগ্যতা আছে, তাদের পরবর্তী শিক্ষাস্তরের (উচ্চশিক্ষা) জন্য প্রস্তুত করা। লো-স্কিলড জনগোষ্ঠী সমাজের মিড লেভেলে কাজ করে, যেমন-পানির মিস্ত্রি, ইলেকট্রিশিয়ান, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, কাঠমিস্ত্রি ইত্যাদি। এই জনগোষ্ঠীও সমাজের জন্য অপরিহার্য। একটি দেশে একজন সরকারি কর্মকর্তা বা একজন শিক্ষক যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমনই একজন ইলেকট্রিশিয়ান বা পরিচ্ছন্নতাকর্মী প্রয়োজন। যেটা তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক এবং মর্যাদা দেওয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হলো উচ্চদক্ষতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী তৈরি করা এবং গবেষণার মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার কনটেন্ট তৈরি করা, যা সময়োপযোগী। উচ্চদক্ষতা সম্পন্ন জনগোষ্ঠী তৈরি করার জন্য দরকার গবেষণা। গবেষণার মাধ্যমে আমাদের দেশের কোন খাতে কী পরিমাণ লোকবল প্রয়োজন, সেটি অনুমান করবে এবং পাশাপাশি বিশ্বায়ন ও ডিজিটালাইজেশনের কথা মাথায় রেখে কী ধরনের দক্ষতা
প্রয়োজন, সেটিও জানা যাবে। সে অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের কাররিকুলাম সংস্কার করে যুগোপযোগী শিক্ষা নিশ্চিত করবে, যেন বেকারত্বের কালো থাবা থেকে দেশ মুক্তি পায়।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা একে অন্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মাধ্যমিক শিক্ষা সফল হবে, যদি প্রাথমিক স্কুল ভালো ছাত্র তৈরি করতে পারে। আবার উচ্চশিক্ষার সফলতা নির্ভর করবে মাধ্যমিক স্কুল ভালো গ্র্যাজুয়েট সরবরাহ করতে পারছে কি না, তার ওপর। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সফল তখন হবে যখন সেগুলো উচ্চশিক্ষার জন্য ভালো ছাত্র তৈরি করতে পারবে। সেই দক্ষ মানবশক্তি আবার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষক হিসেবে অবদান রাখবে। আশার কথা হলো বাংলাদেশের অনেক কৃতী সন্তান বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণার মাধ্যমে কৃতিত্বের সঙ্গে নিজেদের অবস্থান, সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র‍্যাংকিংসহ শিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। এমতাবস্থায় তাদের যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে দেশে এনে এবং এই প্রতিকূল পরিবেশেও যারা দেশে থেকে ভালো গবেষণা করছেন, তাদের সমন্বয়ে শিক্ষাব্যবস্থার যুগোপযোগী পরিবর্তন কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ গঠনের একটি প্রয়াস হতে পারে।

লেখক: পিএইচডি গবেষক, ইউনিভার্সিটি পুত্রা মালয়েশিয়া, এবং সহকারী অধ্যাপক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ইত্তেফাক/এনএন